মরা নদীর জোছনা

মরা নদীর জোছনা

মূর্তালা রামাত

বৃক্ষ

মরা নদীর জোছনা
মূর্তালা রামাত

প্রকাশক
বৃক্ষ
১২/৪ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা
obaedakash@yahoo.co.in

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৮
একুশে বইমেলা ২০১২

স্বত্ব
শারমিন আকতার

প্রচ্ছদ
সঞ্জয় দে রিপন

দাম
১০০ টাকা

Mora Nodir Jochhna a novel by Murtala Ramat
Published by Brikkha 12/4 Purana Paltan Lane Dhaka, Bangladesh
Phone : 01731759473 email : obaedakash@yahoo.co.in
1st Edition Ekushe Boimela 2012
Price Tk. 100.00 $ 3

ISBN 984 70174 0014 7

উৎসর্গ

“এই তুমি গল্প লেখো না কেন?”
প্রিয় মোনামী আপা

ভূমিকা

অনেকদিন ধরেই ফিকশন লেখার চেষ্টা করছি। গল্প আসে, লেখা আসে না। দ্বিধায় ভুগি, ফিকশন কি এভাবে লেখে না ওভাবে? তারপর দূর ছাই বলে হুট করেই একদিন বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে ফেললাম। কিন্তু কিছুতেই গল্পের শেষ খুঁজে পাই না। দেশ ছেড়ে বিদেশে এলাম। গল্প আমাকে ছাড়ল না, পেছন পেছন এলো; গল্পের চরিত্রগুলোও। বছর গড়ালো। অবশেষে তারা একদিন কথা বলে উঠল। আমি *মরা নদীর জোছনা* উপন্যাসটি শেষ করতে পারলাম। একমাত্র পাঠকেরাই বলতে পারবেন এটি কেমন হয়েছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। এই আনন্দই আপাতত আমার ফিকশন লেখার অনুপ্রেরণা।

মূর্তালা রামাত
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

কিন্তু কাল সকাল হইতে তাহার অন্য এক রকম পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। যেন কিছু তীব্র, কিছু কঠোর। সেই পরিপূর্ণ থমথমে জোয়ার-গঙ্গায় যেন হঠাৎ কোথা হইতে ভাটার টান ধরিয়াছে। বাড়ির কেহ কারণ জানে না, শুধু আমরা জানি–

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১.

আকাশ যায় আকাশে
বুকের অনেক গভীরে ঝলমলে শব্দ হয়
নিত্যনতুন অনাবিল পদধ্বনি শুনি
আসছে...

এখানেই ঘুম থেকে জেগে উঠি বারবার
হে স্বপ্ন আমার
ফিরে আস, তাকে নিয়ে
তুমি কি সেই...

ওহে নারী
বাড়িয়ে দাও হাত–
এই সব বিন্দু বিন্দু স্রোত
চোরাবালি ঠেলে
আছে দেখ চেয়ে, হাসিমাখা এই দিনে!

কবিতাটা বের করে আরেকবার পড়েন আশরাফ আলী। ভালোই হয়েছে। সুতপা পছন্দ করবে। তিনি ঘড়ি দেখেন। সময় প্রায় হয়ে গেছে। সুতপার ওখানে আজ ১২টার দিকে যাওয়ার কথা। তিনি রওনা দেন।

সুতপাদের বাড়িটা বেশ নিরিবিলি এলাকায়। স্বামী-স্ত্রী নিজেরা আর একটা বাচ্চা নিয়েই ওদের ছোট্ট সংসার। সুতপার স্বামী নিখিল ডিসি অফিসের সহকারী অফিসার। নিখিলের সাথে আশরাফ আলীর পরিচয় বেশ ক'বছরের। নিখিল হরেন বাবুর দুঃসম্পর্কের ভাগনে। তার মা বাবা কেউ বেঁচে নেই, এক ভাই ছিল সে সন্ন্যাসব্রত নিয়ে বহুকাল ধরে নিরুদ্দেশ। আত্মীয়দের মধ্যে হরেন বাবুই তার

একমাত্র জানাশোনা। এলাকায় হরেন বাবুর হোমিওপ্যাথির দোকান রয়েছে। বিকেল হলেই সেখানে মাঝবয়সীদের জম্পেশ আড্ডা বসে। মাঝবয়সীদের এই আড্ডায় একমাত্র ব্যতিক্রম হল নিখিল। কেবল তিরিশ পেরুনো নিখিলও মাঝেসাঝে এই আড্ডায় শরিক হয়। ডিসি অফিসে চাকরির সুবাদে শহরে কী ঘটছে না ঘটছে অনেক খবরই তার আগেভাগে জানা থাকে। তাই নিখিল থাকলে আড্ডা বেশ জমে। আরেকজনের কারণেও আড্ডার উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে যায়। তিনি হলেন আশরাফ আলী। বক্তা হিসেবে তিনি দারুণ। তিনি যে বিষয়েই কথা বলুন না কেন শ্রোতারা তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। এইতো সেদিনের আড্ডায় তিনি ওবামার বিপক্ষে একচোট দেখে নিলেন। অন্যদের কথা হলো ওবামা বুশের চেয়ে অনেক ভাল প্রেসিডেন্ট হবেন। কিন্তু আশরাফ আলী তা মানতে নারাজ। কীভাবে আপনারা এই কথা বলেন? তিনি সবার উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুড়ে দেন।

আপনি ওবামার জনসমর্থন দেখছেন? এতোগুলো লোক কি এমনি এমনিই ওবামাকে সমর্থন করল? জলিল সাহেবও ছাড়বার পাত্র নন।

আমেরিকানরা আমাদের মতো অশিক্ষিত না, হরেন বাবুও তাকে সাপোর্ট দেন।

দেখেন বুশ প্রথমবারের মত যখন প্রেসিডেন্ট হন তখনও তার জনসমর্থন ছিল অনেক। ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে এতো কুখ্যাতি অর্জন করার পরও বুশকে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট বানাল কারা? ওই আমেরিকানরাই। তাহলে অর্থ কী দাঁড়াল? আমেরিকানরা শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক তারা নিজের দেশের স্বার্থকেই সবসময় বড় করে দেখে। সেই আমেরিকানদের নতুন প্রতিনিধি হল এই ওবামা। সেও আমেরিকার স্বার্থ ভালোমতোই দেখবে। বুশ হামলা করেছিল ইরাকে, আর ওবামা দরকার পড়লে হামলা করবে পাকিস্তানে। তাই বুশ আর ওবামা একই মুদ্রার দুই পিঠ ছাড়া কিছুই নয়, আশরাফ আলী বক্তৃতার ঢংয়ে কথা শেষ করেন।

কিন্তু ওবামাতো বলছে সে বুশের নীতি ফলো করবে না। ইরাক থেকে অচিরেই সৈন্য প্রত্যাহার করবে, করিম সাহেব আস্থার সাথে বলেন।

অবশ্যই করবে না। নতুন নীতি বানাবে। সেই নীতি অনুযায়ী আমেরিকার স্বার্থ ঠিকই বজায় থাকবে। ইরাক থেকে সৈন্য সরিয়ে ইরানে পাঠাবে, আশরাফ আলী তার ধারনায় অটল থাকেন।

আমার মনে হয় না, আমেরিকা ইরান আক্রমণের সাহস পাবে, মৃদুভাষী নিখিল বলে ওঠে।

কী যে বল না, আমেরিকা চালায় ইসরায়েল। ইসরায়েলের জন্য বড় হুমকি হলো ইরান। তার উপর ইরান হল তেলের ডিপো। তাই আজ হোক, কাল হোক আমেরিকা সেখানে হামলা চালাবেই... আশরাফ আলীর মোবাইলে বাসা থেকে ফোন আসায় সেদিনের আলোচনা ওখনেই থেমে যায়। তবে এ ধরনের আলোচনা সাধারণত অনেকক্ষণ ধরে চলে। আশরাফ আলী একবার তর্ক শুরু করলে আর থামতেই চান না। কেবল নিখিলের বাসায় চা খাবার আমন্ত্রণ পেলে আজকাল এর ব্যত্যয় ঘটে।

২.

হরেন বাবুর সূত্রে নিখিলের সাথে পরিচয়ের পথ ধরেই তার বাসায় আশরাফ আলীর যাওয়া আসা। প্রথম দিকে কেবল নিখিলের আমন্ত্রণ পেলেই তিনি সেখানে যেতেন। ধীরে ধীরে পরিবারটির সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। নিখিল জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও সে নিজে ধর্মে বিশ্বাস করে না। আশরাফ আলীরও ধর্মে তেমন বিশ্বাস নেই। শেষ কবে তিনি মসজিদে গিয়েছেন সে কথা তার মনেই পড়ে না। তার বাবা আলতাফ আলী নিজের জীবদ্দশায় তিনবার হজ করেছিলেন। কিন্তু ছেলেকে দিয়ে তিনি কখনো নামাজ পড়াতে পারেননি। এজন্য তার আফসোসের সীমা ছিলো না। একমাত্র ছেলে হওয়ায় আশরাফকে কিছু বলাটাও তার জন্য দুরূহ ছিল। এই সুযোগে আশরাফ হয়ে উঠেছিল একরোখা। দিনরাত ঘুরে বেড়ানো আর কবিতা লেখাই ছিল তার একমাত্র কাজ। মা যতোদিন বেঁচে ছিল ততোদিন আশরাফকে কোনো চিন্তাই করতে হয়নি। তখন সে ভাবতো, এভাবে কবিতা লিখেই সারাজীবন পার করে দেবে। একবার পরীক্ষার খাতায় জীবনের লক্ষ্য রচনা লিখতে গিয়ে সে লিখেছিল–

আমার জীবনের লক্ষ্য

লক্ষ্য নিয়েই মানুষের জীবন। লক্ষ্যবিহীন মানুষ অন্ধ তীরের মতো। জীবনের লক্ষ্য একেকজনের একেকরকম হয়ে থাকে। কেউ হতে চায় ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউ ব্যারিস্টার। আমি ঠিক করেছি আমি এসবের কিছুই হব না। কারণ এরা কেউই ইতিহাসে অম্লান হতে পারবে না। আমি এমন কিছু হতে চাই যাতে এই দেশ, এই জাতিকে কিছু দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকা যায়। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি যে আমি বড় হয়ে কবি হব।

কবি মানে স্বপ্নদ্রষ্টা
যে পাথরে ফোটায় ফুল

অনেক দূর হেঁটে হেঁটে যারা ক্লান্ত
কবিতা তাদেরও জাগায় বারবার
আমি কবি
তোমার চলার পথ...
... ...
... ...
সেবার বাংলা খাতা দেয়ার সময় আজিজ স্যার তাকে ডেকে বলেছিলেন, কবি হতে চাস! কয়টা কবিতা লিখেছিস?
বেশি না স্যার।
স্যার ওরতো খাতা ভর্তি কবিতা, ক্ল্যাস ক্যাপ্টেন জানায়।
দেখি একটা শোনা।
আশরাফ আবৃত্তি করে–

এলিজি
আমি যা চাই তুমি তাই
আমি ছাড়া তুমি নাই
এই বাড়ি এই ঘর
এই নদী এই চর
এই সবই তুমি হবে
আমার সঙ্গে রবে
হে জীবন
তুমি তাই, আমি যা ই!

বাহ্ দারুণতো আজিজ স্যার ওর পিঠ চাপড়ে দেন। শোন, তুই প্রতিদিন আমার ক্লাসে একটা করে নতুন কবিতা শোনাবি।
আশরাফ মাথা নাড়ে।
আর পরীক্ষার খাতায় কবিতা লেখার দরকার নেই। বাস্তব আর পরীক্ষা দুটো দুই জিনিস, বুঝেছিস?
তারপর থেকে ক্লাসের বন্ধুরা আশরাফকে কবি নামে ডাকতে শুরু করে। আশরাফও নতুন নতুন কবিতা লিখে খাতা ভরিয়ে ফেলতে থাকে। আশরাফের বিশ্বাস ছিল সে বিখ্যাত কবি হবেই। কিন্তু মায়ের মৃত্যুটাই তার সবকিছু

ওলটপালট করে দেয়। যেদিন মা মারা যায় আশরাফ সেদিন একটুও কাঁদেনি। আসলে সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে মা নেই। মাকে কবরে দিয়ে আসার পর সে আর পারেনি। হাউমাউ করে কেঁদেছিল। ওখানেই তার সুখের দিন শেষ। মায়ের মৃত্যুর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা আবার বিয়ে করলেন। আশরাফ তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ক্লাস শেষে একদিন ফিরতেই সে দেখে, বাড়িতে নতুন এক মহিলা! বাবা নিজেই তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়, আশরাফ তোমার নতুন মা, সালাম কর।
বাবার সাথে কোনোদিনই তার তেমন কোন খাতির ছিল না। নতুন মা সংসারে আসার পর সেই দূরত্বটা বাড়তেই থাকে, আর কখনোই কমানো যায়নি। তাই আশরাফ আলী সবসময় নিজের সন্তানের সাথে কোনরকম দূরত্ব না রাখার চেষ্টা করেছেন। তারপরও একমাত্র মেয়ে সুপ্তির সাথে কীভাবে যেন আপনা থেকেই একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। তিনি সেটা স্পষ্ট টের পান। সুতপার সাথে দেখা করতে আসার সময় প্রতিবারই তার সুপ্তির কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে কলিংবেলে চাপ দেয়ার আগে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

৩.

কলিংবেল চাপা মাত্রই সুতপা দরজা খুলে দাঁড়ায়। মনে হল আশরাফ আলী এখনই বেল বাজাবেন, এটা সে খুব ভাল করেই জানত।

জাস্ট টাইমে এসেছো, সুতপা হাসে। সুতপা আজ নীল একটা শাড়ি পরেছে। তার উপর লাল লাল ছোপ। সুতপার নিষ্পাপ চেহারার সাথে শাড়িটা বেশ মানিয়েছে। আশরাফ আলী বরাবরের মত মুগ্ধ না হয়ে পারেন না।

সুতপাকে যেদিন তিনি প্রথম দেখেন সেদিনই মুগ্ধ হয়েছিলেন। হরেন বাবুর দোকানে আড্ডা শেষ করে সেদিন নিখিল আর তিনি একসাথেই বেরিয়েছিলেন। দাদা বাসায় চলেন। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন, নিখিল হঠাৎ করেই আমন্ত্রণ জানায়।

আরেকদিন খাব।

আরে চলেন না। চা খেতে খেতে আপনি যে বীমাটার কথা বলছিলেন সেটা নিয়েও আলোচনা করা যাবে, নিখিল নাছোড়বান্দা। এইতো সামনের মোড় ঘুরলেই আমার বাসা, চলেনতো। নিখিল প্রায় জোর করেই তাকে বাসায় নিয়ে আসে। দরজা খোলে সুতপা। মিষ্টি মায়া ভরা হাসি হাসি চেহারা। আশরাফ আলীকে দেখে সে মোটেই অবাক হয় না। আশরাফদা! আসুন ভেতরে আসুন, যেন তিনি এ বাড়িতে অনেকদিন ধরেই আসা যাওয়া করেন ।

সুতপার ব্যবহারে তিনি অবাক না হয়ে পারেননি। তার চেহারায় অপ্রস্তুত হবার ছাপও পড়েছিল।

সেটা বুঝতে পেরেই সুতপা হাসতে হাসতে বলে, কী অবাক হলেন! নিখিল আপনার কথা এত বলে যে আপনাকে চিনতে আমার একটুও বেগ পেতে হয়নি। আজ কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবেন না। সুতপা তখনই রান্নার আয়োজনে লেগে পড়ে।

সেদিন নিখিলের বাড়ি থেকে রাতের খাওয়া খেয়ে তবে তিনি বের হতে পেরেছিলেন। এরপর থেকে প্রায়ই ওদের বাড়িতে তার যাওয়া পড়ে। সুতপা ভাল কিছু রান্না করেছে, তিনি হাজির। ভাল একটা মুভি আনা হয়েছে, নিখিল তাকে নিয়ে এল, চলেন দাদা মারাত্মক একটা মুভি! ঘরের জন্য নতুন কিছু কেনা হবে, আশরাফদা থাকলে ভাল হতো। কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে, আশরাফদা না থাকলে মজাই হবে না। নিখিলের অসুখ, ডাক্তার দেখাতে আশরাফ আলীই ভরসা। সুতপার মা হবার দিনে নিখিল অ্যাক্সিডেন্ট করল, দৌড়ঝাপ যা করার তাকেই করতে হল। এভাবেই তিনি সুতপাদের পরিবারের একান্ত অংশে পরিণত হয়েছেন। নিখিলের এতটুকুন ছেলে পাপ্পুও তাকে খুব পছন্দ করে। আশরাফ আঙ্কেলকে পেলেই সে বাড়ি মাথায় করে ফেলে। মাঝেমাঝে তিনি পাপ্পুকে নিজের বাসায় নিয়ে আসেন। তার স্ত্রী তাহমিনা, মেয়ে সুপ্তি পাপ্পুকে খুবই আদর করে। পাপ্পু বাড়িতে আসলেই তাদের বাড়িটা যেন প্রাণ ফিরে পায়। বাড়িতে ঢুকেই সে কচি কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, বম্মা তই?

এইতো আমি এখানে, তাহমিনা সুর করে উত্তর দেয়।

পাপ্পু সারা ঘরময় তাহমিনাকে খুঁজে বেড়ায়। পর্দার আড়াল, খাটের তলা, রান্নাঘর, বাথরুম কিছুই তার খোঁজার আওতা থেকে বাদ যায় না। এই লুকোচুরি খেলা বেশকিছুক্ষণ ধরে চলে। মাঝেমধ্যে সুপ্তি এসে তার সাথে যোগ দেয়। তারা দুজন মিলে তাহমিনাকে খুঁজে বের করে। তিনজনের এই খেলাটা আশরাফ আলী দূর থেকে উপভোগ করেন। তার ছেলে আসিফের খেলার ধরনও ছিল অমন। হারিয়ে যাওয়ার আগের দিনও আসিফ এসে বলেছিল, বাবা লুকাও, আমি খুঁজি। তখন আসিফের বয়স ছিল দুই বছর।

আসিফ তাদের সংসারে এসেছিল অপার সৌভাগ্য নিয়ে। বিয়ের পর আস্তে আস্তে তাহমিনার সাথে তার যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল আসিফ সেটাকে প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছিল। ও হারিয়ে যাবার পর সেই দূরত্বটা আবার ফিরে এসেছে। দিন দিন বড় হচ্ছে। তাহমিনার সাথে এই দূরত্বের কথা চিন্তা করলেই আশরাফ আলী অবাক হন। ইউনিভার্সিটি জীবনে তিনি যখন তাহমিনার প্রেমে পড়েন তখন তার মনে হয়েছিল একমাত্র এই মেয়ের পক্ষেই তাকে সারাজীবন ধরে বুঝতে পারা সম্ভব! অথচ সেই তাহমিনাই এখন তার সবচেয়ে দূরের জন!

তাহমিনার সাথে হুট করেই তার পরিচয় হয়। বাবার সাথে তার সম্পর্ক তখন একেবারেই তিক্ত। বাবার আরেকটা বিয়ে সে কিছুতেই মানতে পারছিল না। বাবার সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক থাক, নতুন মাও সেটি চাচ্ছিলেন না। বাড়িতে এসেই নতুন মা প্রথম যেটা করলেন সেটা হল রাত দশটার পর বাড়ির মেইন গেটে তালা মেরে দেয়া। অথচ তিনি ভাল করেই জানতেন যে রাত করে বাড়ি ফেরা আশরাফের নিত্যদিনের অভ্যাস। তারপর যেটা করলেন সেটা হল, তার এক দূরসম্পর্কের ভাগ্নিকে তিনি বাড়িতে এনে তুললেন। সেই ভাগ্নির জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশরাফকে তার থাকার ঘরটা ছেড়ে দিতে হল। এরপর আশরাফ একদিন শুনল সে নাকি সেই মেয়েকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করে, আজেবাজে প্রস্তাব দেয়! ছেলের নামে এই অভিযোগ শোনার পর আলতাফ আলী বাড়িতে বিচার বসালেন। নতুন মায়ের ভাগ্নিকে আলতাফ আলী সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খালাকে তুমি যা বলেছ তা কি সত্যি?

মেয়েটা তার খালার দিক একবার তাকিয়ে বলল, সত্যি।

প্রমাণ আছে?

মেয়েটা সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকায়।

কে?

মর্জিনা।

মর্জিনা নতুন মায়ের সাথেই আশরাফদের বাড়িতে এসেছিল। আলতাফ আলী পুরোনো কাজের লোক ফুলবানুকে প্রথমে বিদায় করতে চাননি। নতুন মা তাকে বোঝালেন ছোট্ট একটা বাড়ির জন্য দুজন কাজের লোকের কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ফুলবানুর নাকি হাতটানের অভ্যাস আছে। প্রায়ই সে এটা ওটা সরায়। আলতাফ আলী খুবই অবাক হলেন। ফুলবানু তার বাড়িতে অনেকদিন ধরে আছে। তাকে তিনি বিশ্বস্ত বলেই ভাবতেন। অথচ সেই ফুলবানুই চুরি করার সময় তার নতুন বৌ'র কাছে কয়েকবার হাতেনাতে ধরা পড়েছে! সঙ্গত কারণেই তিনি ফুলবানুকে বাড়িতে রাখা নিরাপদ ভাবলেন না। ফুলবানুর বিদায়ের পর মর্জিনাই বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করে। ফুলবানুর চেয়ে মর্জিনাকেই আলতাফ আলীর বেশি পছন্দ হয়। মেয়েটা বেশ ধর্মভীরু, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, পর্দা করে। একদিন গভীর রাতে কীসের শব্দে যেন ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর আলতাফ আলী বাইরে বেরিয়ে দেখেন মেয়েটা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছে। পরদিনই তিনি বৌকে ডেকে মর্জিনার টাকাপয়সা একটু বাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। এ বাড়িতে মর্জিনার ওই রাতটাই ছিল সবচেয়ে টেনশনের। বাড়ির দারোয়ান কুতুব সে রাতে

মর্জিনার ঘরেই ছিল। এমনটা প্রায়ই ঘটে। ব্যাপারটা নতুন মা'র অজানা নয়। তিনি বরং মর্জিনাকে প্রশ্রয়ই দেন। মর্জিনা আশেপাশে থাকলে তার অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে পুরোনো প্রেমিক রফিকের সাথে তার সম্পর্কটা মর্জিনার কারণেই এখনো আগের মতো বহাল তবিয়তে টিকে আছে। সেদিন মাঝরাতে মর্জিনা কুতুবের জন্য খাবার আনতে ডাইনিং রুমে গিয়েছিল। অন্ধকারে হাতের ধাক্কায় টেবিল থেকে বাটি পড়ে যেতেই ঝনঝন শব্দ হয়। আর তাতেই জেগে ওঠেন আলতাফ আলী। মর্জিনার উপস্থিত বুদ্ধি সেবার তাকে বাঁচিয়ে দেয়। সেই মর্জিনাকেই আশরাফের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে ডাকা হয়।

মর্জিনা, তামান্না তোমাকে সাক্ষী মানছে। তুমি যা যা জান, সত্যি করে বল। আলতাফ আলী গম্ভীর গলায় মর্জিনাকে আদেশ করেন।

মর্জিনা আশরাফের চোখের দিকে তাকিয়েই গড়গড় করে কাহিনীর বর্ণনা দেয়। আশরাফ কবে কীভাবে কয়বার নতুন মায়ের ভাগ্নিকে উত্ত্যক্ত করেছে তার বিশদ বিবরণ শুনে আশরাফের ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না জানার পরও আশরাফ সেদিন প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার কোন কথাতেই কান না দিয়ে আলতাফ আলী বিচারের রায় ঘোষণা করেন, আশরাফ তুমি এখন থেকে হোস্টেলেই থাকবা, এ বাড়িতে তোমার থাকা বন্ধ।

অবশ্যই মিস্টার আলতাফ আলী অবশ্যই, বলে এক কাপড়েই আশরাফ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

এরপরে আশরাফ বখে যেতে পারত, নেশা ভাঙ্গ খেয়ে ভবঘুরে হতে পারত অথবা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাউন্ডুলে হতে পারত। তবে এসবের কিছুই সে হয়নি। সম্ভবত লিনার কারণে।

কলেজে ফর্ম জমা দেবার দিনেই মেয়েটির সাথে ওর ঝগড়া লেগেছিল। দেরিতে এসেও বন্ধুদের কল্যাণে লাইনের প্রথম দিকে দাঁড়াতেই মেয়েটি ফোঁস করে ওঠে, এই লাইন ভাঙলে কেন?

চেনা নেই জানা নেই অপরিচিত একজনকে প্রথম চান্সেই তুমি বলে কৈফিয়ত তলব! মেয়েটির সাহস দেখে আশরাফ অবাক না হয়ে পারেনি। আপনাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি, আশরাফ মৃদু হাসে।

অবশ্যই দিতে হবে, আমরা এতোক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি তার কোন দাম নেই!

আপনাকে দাঁড়াতে বলেছে কে?

মানে?
মেয়েদের লাইনতো আলাদা। আপনি ছেলেদের লাইনে দাঁড়িয়েছেন কেনো?
মেয়েটা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কিছু মেয়ে অন্যদিকের একটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেয়ে মেয়েগুলোকে বুঝিয়ে নিজের লাইনে নিয়ে এসে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে, ছেলেমেয়ে কি আলাদা নাকি! সবাই এক, লাইনও একটা হবে।
মেয়েটার মোটিভেটিং পাওয়ার দেখে আশরাফ তখনই তার নাম দিয়ে দেয় লিডার। ফর্ম জমা দিয়ে যাবার সময় সে মেয়েটিকে বলে, লিডার আসি, আবার দেখা হবে। মেয়েটি হাত উঁচিয়ে আশরাফের দিকে তেড়ে আসে। বাড়ি ফিরতে ফিরতেই আশরাফ তাকে নিয়ে একটা কবিতা বানিয়ে ফেলে–

মেয়ে
তেড়ে এসেছিল মেয়ে
হাত দুটো পাকিয়ে
মনে হল এই দেবে
পরপারে পাঠিয়ে
চোখে চোখ পড়তেই
দেখি মেয়ে হাসছে
তবে কি মেয়েটা মনে
মনে ভালোবাসছে!

প্রথম ক্লাসের দিন আশরাফ মেয়েটাকে ক্লাসরুমে আতিপাতি করে খুঁজেছিল। সবার মুখ অসংখ্যবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পরও পরিচিত মুখটি সেদিন চোখে পড়েনি। হতাশ আশরাফ ক্লাসে বসেই প্রথম কবিতাটির দ্বিতীয় পর্ব লিখে ফেলে–

মেয়ে-২
একটা পাখির বুক ভেঙ্গে যায়
একটা পাখি একা
হারিয়ে গেছে আরেক পাখি
আর কি হবে দেখা!

চোখটা ভরা ভালোবাসা
ওই পাখিটার ছিল
এই চোখটা তার জন্য
থাকল ছলছল।

কতো সহজেই না আশরাফ আলী সে সময় কবিতা লিখতে পারতেন! এখন তিনি আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। বর্তমানে তার কবিতার একমাত্র শ্রোতা হচ্ছে সুতপা।

৪.

তোকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছেরে সুতু, সোফায় বসতে বসতে আশরাফ আলী বলেন।

সুতপা হাসে। তুমিতো প্রতিদিনই এমন বল।

তোকে যে সবসময়ই সুন্দর লাগে!

থাক হয়েছে, আজ কবিতা এনেছ?

এনেছি।

দাঁড়াও চা বানিয়ে আনি। খেতে খেতে শুনবো। চা'র সাথে কিছু?

নারে। শুধু চা। মধু দিয়ে বানাস। পাপ্পু কই?

তুমি কি পাপ্পুর সাথে দেখা করতে এসেছ না আমার সাথে?

তোর সাথে দেখা করতে এসেছি, আর পাপ্পুকে নিয়ে যেতে এসেছি।

পাপ্পুকে তিনতলায় খেলতে পাঠিয়েছি।

ও।

সুতপাদের ড্রইংরুমটা গোছানো, ছিমছাম। দোতলার একপাশে ছোট্ট দু'রুমের বাসা। মাঝখানে ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেস। ড্রইং রুমটা পুরোপুরি বেতের আসবাব দিয়ে সাজান। টেবিলের ওপর ছাইদানিটাও বেতের। নিখিল বেশ সিগারেট খায়। একটার পর একটা।

সহ্য করিস কীভাবে? তিনি সুতপাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমার অসুবিধা হয় না। সুতপা এমনভাবে মাথা ঝাঁকায় যেন নিখিলের অন্যসব গুণের কাছে এই দোষটুকু খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার। তুমিওতো খাও, তাই না? সবজান্তার ভঙ্গিতে সুতপা পরক্ষণেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল।

আশরাফ আলী না বলতে পারেননি। কলেজ জীবনে তিনি প্রচুর সিগারেট খেতেন। ইউনিভার্সিটিতে এসে অভ্যাসটা বাদ দিতে হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে তাহমিনার প্রথম শর্ত ছিলো সিগারেট ছাড়তে হবে। তিনি একবাক্যে শর্তটা মেনে নিয়েছিলেন। তারপর অনেকদিন হয়ে গেছে সিগারেট ছুঁয়ে দেখা হয়নি। তবে

কিছুদিন হল সিগারেটে তার আবার নেশা জেগেছে। সিগারেট টানতে টানতে কবিতা লেখার মজাই আলাদা। নতুন করে সিগারেট খাবার অভ্যাসের কথা তাহমিনা এখনও জানে না। জানলেও তার কিছু এসে যাবে বলে মনে হয় না। এমন কেন হল!

কবিতা ভাবছ? সুতপার কণ্ঠে তার ধ্যান ভাঙ্গে।

হ্যাঁ।

মিথ্যা বললে তোমার বাম চোখের পাতা কাঁপে, তুমি জান?

আশরাফ আলী খানিকটা জড়সড় হয়ে যান। সুতপা কীভাবে যে সবকিছু বুঝে ফেলে তা তিনি ভেবে পান না। আগেও এমন হয়েছে। তবে সুতপার কাছে ধরা পড়ার ভেতর আলাদা একটা মজা আছে। তাই মাঝে মাঝে তিনি ইচ্ছে করেই তাকে মিথ্যে বলেন। এই নিয়ে তার একটা কবিতা আছে।

মিথ্যে শুধু তোমার কাছেই উথাল দিয়ে ওঠে
এই মিথ্যের বিনিময়ে খানিক হাসি জোটে
তোমার হাসি তোমার শাসন তোমার অবাক চোখ
খানিকক্ষণের জন্য না হয় একটু আমার হোক..

কবিতাটা তিনি এখনও সুতপাকে দেননি। এরকম অনেক কবিতার কথাই সুতপার অজানা।

আবার কী ভাবছ? চা এগিয়ে দিয়ে সুতপা সোফায় আয়েস করে বসে।

কবিতার কথা ভাবছি।

এবার সত্যি বলেছ, কই কবিতা শোনাও।

দুটো আছে। কোনটা শুনবি?

দুটোই।

আশরাফ আলী পকেট থেকে প্রথম কবিতাটা বের করে ভরাট গলায় আবৃত্তি করেন।

শোনার পর সুতপা প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, পরেরটা শোনাও।

কেমন হয়েছে বললি না?

দুটো শুনে একসঙ্গে কমেন্ট করব।

আশরাফ আলী দ্বিতীয় কবিতাটা পড়েন–

ছুটে আসা
সাগর পানে ছোটে নদী
নদীর পানে জল,
মেঘ ছুটে যায় মেঘের পানে
বৃষ্টি টলমল।

পথ ছুটে যায় পথিক পায়ে
পথিক ছোটে পথে,
ওড়ে পাখি পাখার জোরে
নীলের সাথে সাথে।

মনটা আমার ছোটে মনে
ইশারাতে কারো,
মনের সাথে মনের মিলন
আরেকটু হোক গাঢ়।

কবিতা শেষ হতেই ঘরের ভেতর নীরবতা নেমে আসে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। ডান পাশের জানালা দিয়ে ড্রইংরুমের দেয়ালে খানিকটা রোদ এসে সুতপার গায়ের ওপর পড়েছে। রোদের তাপ বাড়ায় গায়ে অনেক্ষণ ধরে বসে থাকা প্রজাপতিটা উড়ে যেয়ে ড্রইংরুমের দেয়ালে গিয়ে বসে। আশরাফ আলী ভাল করে খেয়াল করেন। সুতপার শাড়ির প্রতিটা লাল ছোপের ভেতর সোনালি রংয়ের প্রজাপতি আঁকা। সরাসরি রোদ পড়ায় সেগুলোকে খুব জ্যান্ত দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে এখুনি উড়ে গিয়ে দেয়ালে বসবে। বাহ্ বেশতো! দুজন একসাথেই বলে ওঠে।
নিজের কবিতাকে নিজেই বেশ বলছো! সুতপা অবাক হয়।
দুজন একসাথে একই কথা বলার পর আশরাফ আলী খানিকটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। দুজন একসাথে একই কথা বললে কী যেন হয়? কী যেন হয়! তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। সুতপার কথায় তার চমক ভাবটা কাটে। তিনি লাজুকভাবে বলেন, নিজের কবিতা না। তোর শাড়িটা বেশ!
তাই, সুতপা শাড়ির দিকে এক নজর তাকায়। তার হাসিখুশি চেহারায় আচমকাই আষাঢ়ের কালো ছায়া পড়ে।
কী হল!

কিছু না । আর কোন কবিতা এনেছ?
তোর কী হয়েছে সেটা আগে বল।
থাক না ওসব।
আহ্, বল না।
সুতপার ঠোঁটজোড়া কেঁপে ওঠে, এই বিয়েবার্ষিকীতে নিখিল শাড়িটা কিনে দিয়েছে। এরকম একটা শাড়ির শখ আমার অনেক দিনের। অনেক কষ্টে সে কান্না চেপে রাখে, এটার দাম জান?
না।
অনেক! সুতপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এটা কিনতে যেয়ে ওর বেতনের প্রায় পুরোটাই শেষ! কারেন্ট চলে গেছে। ঘরে গরম বাড়ছে। সুতপার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
আশরাফদা, তোমার টাকাটা আজকে না নিলে হয় না? সুতপা কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।
অসুবিধা নেই আরেক দিন দিস। আশরাফ আলী আলতো করে সুতপার হাতটা নিজের হাতে নেন।
বাইরে রোদ বাড়ছে। একটু বাতাসও নেই। গাছের পাতারা স্থির। ঘরের প্রজাপতিটা দেয়াল থেকে দেয়ালে গিয়ে ওড়ে।

৫.

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যাবার অভ্যাসটা আবার ফিরে এসেছে। কলেজের হোস্টেলে প্রায় মাঝরাতেই আশরাফ আলীর ঘুম ভেঙ্গে যেত। মা'র কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত লিনার কথা। মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গা মানেই নতুন কোন কবিতার আবির্ভাব। একের পর এক কবিতা সেদিনগুলোতে তিনি লিখে গেছেন। তখনকার সব কবিতাই ছিলো লিনা কেন্দ্রিক। প্রথম ক্লাসে লিনার সাথে দেখা না হলেও পরের ক্লাসেই লিনার সাথে তার দেখা হয়েছিল। ক্লাস শেষে লিনাই তাকে পেছন থেকে ডাক দেয়, এই শোন।

আশরাফের বুকটা ধক করে উঠেছিল, সেই মেয়েটা! সে ঘুরে মেয়েটার দিকে তাকায়, আরে...

চিনতে পেরেছ তাহলে!

চিনব না কেন, এই কলেজেই তাহলে ভর্তি হয়েছেন?

হ্যাঁ, মেয়েটা চটপট উত্তর দেয়। ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটা করতে পারিনি। মামার বিয়ে ছিল। কেমন হয়েছে?

খারাপ না।

তারপর তোমার নাম কী? মেয়েটা চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করে। ক্লাস লেকচার খাতাটা দাওতো, রুটিনটা তুলি। বলতে বলতেই সে অনুমতির তোয়াক্কা না করেই আশরাফের হাত থেকে খাতা নিয়ে দেখতে থাকে। কই নাম বললে না? ওহ, আশরাফ আলী, খাতার ওপরেইতো লেখা আছে! চল লাইব্রেরিতে বসি।

আশরাফ মেয়েটার আগ বাড়ান স্বভাবে মনে মনে খানিকটা বিরক্ত হয়, মেয়েটা এত বকবক করে কেন? আবার মেয়েটার সাবলীল আচরণ তার ভালোও লাগছিল, মনে হচ্ছিল মেয়েটা তার অনেক দিনের চেনা। সেই চেনা পরিচয়টা যত দিন গেছে ততই গাঢ় হয়েছে। আশরাফের কবিতার অসম্ভব ভক্ত ছিল লিনা। প্রতিদিন তার জন্য একটা করে নতুন কবিতা লিখতে হতো। আশরাফের কবিতা তাহমিনারও খুব প্রিয় ছিল। তাহমিনা এখন তার পাশে শুয়ে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ঝুম বৃষ্টি। জানালার ফাঁক

গলে আসা বৃষ্টির আলতো গন্ধে ঘরটা নরম হয়ে আছে। রাস্তার লাইটপোস্টের আলো পাশের বিল্ডিং ঘেষে ঘরে এসে ঢুকেছে। সেই আলোতে আশরাফ আলী ঘুমন্ত তাহমিনার মুখের দিকে তাকান।

তাহমিনা গুটিসুটি মেরে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। পুতুলের মত চেহারা তার। চোখ জোড়া গভীর। খাড়া নাক, টানা কপাল। তবে তার টকটকে ফর্সা ত্বক আগের চেয়ে খানিকটা যেন ম্লান হয়ে গেছে। কপালের চুলগুলোর মাঝ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দু'একটা কাঁচাপাকা চুল। চিবুকে অবসাদের একটা মলিন ছায়া তার চেহারাটাকে আরো বেশি মায়াময় করে তুলেছে। ঠোঁটের উপরের তিলটা আগের মতোই আছে, তিরতির করে কাঁপছে। মুখে খানিকটা হাসি কি লেগে আছে? তাহমিনা ঘুমের ভেতর মাঝে মাঝেই নিঃশব্দে হেসে ওঠে। বিয়ের তৃতীয় দিনেই তার এই রূপটা আশরাফের চোখে পড়ে। তারপর থেকে প্রায়ই সে মাঝরাতে উঠে তাহমিনার দিকে তাকিয়ে থাকতো। কখন সে একটু হেসে উঠবে। এটা জেনে মাঝে মাঝে তাহমিনা ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে ইচ্ছে করে হাসত। হাসলে তাকে পুরোপুরি সোফিয়া লরেণের মতো লাগে। ইউনিভার্সিটিতে তাহমিনার এই হাসিই আশরাফকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করেছিল। কী সুন্দর করে হেসে হেসে কথা বলতো সে। যেন পৃথিবীর কোন দুঃখই তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। আশরাফের মনে তখন অনেক দুঃখ। সেই দুঃখ ভাগাভাগিতে তাহমিনাই ছিল তার সবচেয়ে আপনজন। লিনার মত তাহমিনাও তার কবিতা পছন্দ করতো। হাসতে হাসতে সে বলতো, এত সুন্দর কবিতা তুমি কীভাবে লেখো আশরাফ?

সুন্দর মানুষের সঙ্গ পেলে সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখা যায়।

তাহলে আমি কেন সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে পারি না?

তুমিতো আর সুন্দর মানুষের সাথে ঘোরো না।

কবিদের মন অনেক সুন্দর হয় জানতাম!

আমার মনটা অত সুন্দর না।

কেন?

দুঃখ দুঃখ দুঃখ, হাজার হাজার দুঃখ এসে আমার মনটাকে কুৎসিত করে দিয়েছে।

আশরাফ তাহমিনাকে এক এক করে সব দুঃখের কথা বলেছিল। লিনার কথাও। তাহমিনা তার প্রতিটা দুঃখের সমব্যথী হয়েছিল। সমস্ত মমতা দিয়ে তিল তিল করে আশরাফকে সে আগলে রাখত। সিগারেট ছাড়, গাঁজা খেতে পারবে না, চুল ছোট করো, দাড়ি কামাও, প্রতিদিন লাইব্রেরিতে বস, ঠিকমত খাওয়াদাওয়া কর, শরীরের যত্ন নাও ইত্যাদি নানারকম আদেশ বিধিনিষেধের বেড়াজালে ধীরে ধীরে আশরাফকে

সে নিজের মত করে গড়ে তোলে। বাড়ি ছেড়ে কলেজের হোস্টেলে ওঠার পর থেকেই বাবার সাথে আশরাফের কোন যোগাযোগ নেই। তার মৃত্যুর খবর শুনে শেষ দেখা দেখতেও সে বাড়িতে যায়নি। লোকমুখে শুনেছে বাবা তার সব সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে দিয়ে গেছেন। ও নিয়ে তার কখনোই কোন মাথাব্যথা ছিল না। ছাত্র পড়াতে পড়াতে ততোদিনে সে উপার্জন করতে শিখে গেছে। ইউনিভার্সিটির দিনগুলো ভালোই কাটছিল। তাহমিনার সংস্পর্শে সে ফিনিক্স পাখির মত ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার কাছে ভবিষ্যত তখন ছিল একেবারেই ফর্সা। অনার্স পাশের পর বিসিএস নয়ত ভাল একটা চাকরি, তারপরেই বিয়ে। কবিতা লেখা

তখনও চলছিল–
সামনে, সামনেই
আলো– আমাদের পথ জুড়ে
কেউ নেই, শুধু আমরাই

আহ্, অনুপমা
কতোদিন পর
এভাবে বাতাসে উড়িয়ে চুল
হাঁটছি পাশাপাশি আর
তোমার ঘ্রাণে তৈরি হচ্ছে নক্ষত্রের নক্ষত্র

অনুপমা?
কাধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ–
সবেতো সকাল!

ঘুমন্ত তাহমিনার মাথার কাছেই ঘড়ি। ঘড়িতে টুং করে আওয়াজ হয়, রাত তিনটা। সকাল হতে আরো অনেক বাকি। তাহমিনার মুখ জুড়ে এখনো সেই হাসি লেগে আছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছেই। আশরাফ আলীর মনে হয় বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। এই মুহূর্তে বৃষ্টিতে ভিজতে তার খুব ইচ্ছা হয়। মনে মনে তিনি তাহমিনাকে বলেন, এই বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। চল না বৃষ্টিতে খানিক ভিজে আসি, এই। তার কথা শুনেই যেন তাহমিনা চোখ মেলে তাকায়। মুখের উপর ঝুঁকে থাকা আশরাফ আলীকে দেখে সে ঝটকা মেরে উঠে বসে। তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। গলার কাছে হাত নিয়ে সে অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, না! আশরাফ না!

৬.

চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি, নাস্তার টেবিলে সুতপা নিখিলকে বলে।
কোথায় যেতে চাও? পত্রিকা থেকে চোখ না সরিয়ে নিখিল জানতে চায়।
তুমিই বল।
আমি কোথাও যেতে চাই না । টাকাপয়সা নেই।
তা থাকবে কেন? শুধু নেশা করার সময় টাকা থাকে!
মদ কি তোমার বাপের টাকায় খাই? পেপার থেকে চোখ উঠিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে নিখিল জবাব দেয়।
সুতপার চোখ জলে টলটল করে ওঠে। তবুও সে শান্ত থাকে। যার টাকায়ই খাও, মদ খাওয়া কি ভাল?
ভাল খারাপ আমি তোমার কাছ থেকে শিখব না।
শিখো না। দয়া করে সংসারের দিকে একটু নজর দাও, সুতপা প্লেট গোছাতে গোছাতে বলে।
নজর দেই না বলতে চাচ্ছ? নিখিলের গলা চড়ে।
চেঁচিও না। পাপ্পু ঘুমাচ্ছে।
কেন চেঁচাব না? নিখিল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে যায়। হাতের পেপারটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে সে আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। আমি নজর না দিলে সংসার চলছে কেমন করে?
কেমন করে তুমি জান না? সুতপা সরাসরি তার চোখের দিকে তাকায়।
সাপের ফোঁস করে ওঠা ফণা নিমেষেই চুপসে যায়। গত ক'মাস ধরে ওদের সংসার চলছে ধারের ওপর। আশরাফ আলীর কাছ থেকে ধার করে সুতপা সংসার চালাচ্ছে। তার কাছ থেকে ধার চাইতে সুতপা প্রথমে রাজি হয়নি। তুমিই বল না, বিছানায় নিখিলের বুকের ভেতর শুয়ে আদুরে ভঙ্গিতে সে বলেছিল।
আমি বললে সে দেবে না।
কেন!

আমাকে তেমন একটা পছন্দ করে না, তোমাকে করে।
যাহ্। তোমার সাথেইতো হাসি ঠাট্টা বেশি করে।
তাতে কি? তোমাকেই বেশি পছন্দ করে।
কী করে বুঝলে?
চোখ দেখে। নিখিল একটা সিগারেট ধরায়। তোমাকে দেখলেই ওনার চোখে একটা খুশি খুশি ভাব আসে, আমি খেয়াল করেছি।
তুমি কি জেলাস? সুতপা নিখিলের লোমশ বুকে বিলি কাটে।
না, বেচারার জন্য আমার কষ্ট হয়।
আমারও। বৌদি, সুপ্তি কেউ তার সাথে ভাল করে কথা বলে না।
হ্যাঁ। ওনাদের প্রবলেমটা কি আমি বুঝি না। ছোট ছেলেটা হারিয়ে যাবার পর থেকেই নাকি বৌদি আশরাফদাকে সহ্য করতে পারে না। অ্যাক্সিডেন্টতো অ্যাক্সিডেন্টই, তাই না। তার জন্য একটা লোকের সাথে এমন করাটা কি ঠিক?
না, এটা ওনাদের একদমই উচিত হচ্ছে না। মেয়েটাও হয়েছে মায়ের মত, বাপ যেন দুই চোখের বিষ। সুতপা উঠে বসে শাড়ি ঠিক করে। অথচ আশরাফদার মত লোককে বাবা হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।
লোকটা যেমন স্মার্ট, তেমন তার নলেজ।
ম্যানারও জানে সেরকম।
সেজন্যই বলছিলাম তুমি ধার চাইলে না করতে পারবে না। নিখিল অ্যাশট্রেতে শেষ ছাই ঝাড়ে। ভদ্রলাকেরা মেয়েদের মুখের উপর না বলতে পারে না।
নিখিল বেতন যা পায় তাতে তিনজনের সংসার টেনেটুনে চলেই যায়। সুতপা ওতেই খুশি। নিখিল অনেকবার আকার ইঙ্গিতে ঘুষের কথা তুলেছে। কিন্তু ঘুষের ব্যাপারে সুতপার ঘোর আপত্তি। তার এক কথা ঘুষের টাকা আমিও খাব না, ছেলেকেও খাওয়াব না। ওতে অমঙ্গল হয়। তুমি যদি ঘুষ খাও আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। নিখিল জানে সুতপার যাবার কোন জায়গা নেই। সুতপার মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন। বড় ভাইটিও বহুবছর ধরে নিরুদ্দেশ। জায়গাজমি যা ছিল তাও পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খেয়েছে। বিয়ে দিয়েই সুতপার জ্যাঠারা তাদের দায়িত্ব সেরেছেন। এদেশে তারা কেউ এখন থাকেনও না। নিখিলই সুতপার সব। সুতপার চলে যাবার হুমকি শুনে তাই সে বিচলিত হয় না।
প্রথম প্রথম ঘুষে খেতে নিখিলেরও মন সায় দিত না। এডিসি সাহেব একদিন বললেন, নিখিল আমরা সবাই টাকা পাচ্ছি। আপনি না নিলে আমাদেরতো খারাপ লাগে, নাকি? ঘুষ না ভেবে এটাকে নায্য পাওনা ভাবুন না। সরকার আমাদের যা বেতন দেয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দেয় তার তিন ডবল। আমার বন্ধু আর আমি

একইসাথে পাশ করলাম। সে ঢুকল বেসরকারি ব্যাংকে, বিসিএস দিয়ে আমি এখানে। বন্ধুর অর্ধেক বেতনও আমি পাই না। বলুন এটা কি আমাদের প্রতি অন্যায় না? উপরি না খেলে এখনকার বাজারে এই বেতনে টেকা দুষ্কর।
মন যে সায় দেয় না স্যার।
মন সায় না দিলেও অনেক কিছু করতে হয়। এই যে সরকারি দলের পাতি নেতাদের হুমকি ধামকিতে আমাদের জ্বি হুজুর জ্বি হুজুর ভাব করতে হয় এতে মনের সায় আছে বলে মনে করেন? নেই। তারপরও করি।
কিন্তু স্যার বিবেক?
বিবেক! এডিসি সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বিবেক বলে কিছু আছে নাকি! বিবেক থাকলে গার্মেন্টসের মেয়েরা যখন তিন মাসের বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামে তখন তাদেরকে আমরা পেটাই কীভাবে? ফিলিস্তিনে অসহায় শিশুগুলোর ওপর ইসরায়েল যখন ট্যাংক তুলে দেয় তখন আমরা চুপ থাকি কীভাবে? বিবেক আসলে একটা সান্ত্বনা, একটা ধাপ্পা। পরিস্থিতিই সবচেয়ে বড় বিবেক, কী বলেন?

পরিস্থিতির কারণে নিখিল টুকটাক উপরি যা পায় তা মদ খেয়েই উড়ায়। নেশার অভ্যাসটা সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। নিখিলের বাবা অখিল পোদ্দার পানির মত মদ খেতেন। আর নেশার সুরে বলতেন জমিদার বংশের ঐতিহ্য খানিকটা ধরে না রাখলে কি চলে? লুকিয়েচুরিয়ে বাপের মদের বোতলে চুমুক দিতে দিতেই নিখিলের মদ খাওয়ার হাতেখড়ি। ছাত্রজীবনে অভ্যাসটা জাঁকিয়ে বসে। বিয়ের পর সুতপার কারণে সে অনেক সংযত হয়েছে। টুকটাক যা খাওয়ার বাইরে থেকেই খেয়ে আসে। নিখিলের এই একটাই বদঅভ্যাস, সুতপা জানে। মদ খেয়ে নিখিল কখনো মাতাল হয় না। অভ্যাসটা ছাড়াতে না পেরে সুতপা ওটুকুতেই সন্তুষ্ট। মদ খাবা খাও, সংসারে অশান্তি না হলেই হল। কিন্তু হালে ওদের সংসারে অশান্তি চলছে। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে নিখিল। সুতপার ধারণা নিখিলের মদ খাওয়ার পরিমাণটা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। আসলেও তাই। তার চেয়েও বড় কথা সে এখন জুয়ার আসরে ঢুকেছে। বড় সাহেবদের সাথে ক্লাবে বসে মদ গিলতে গিয়েই এই বিপত্তির শুরু। প্রতিরাতে জুয়া না খেললে তার এখন আর ভাল লাগে না। জুয়া খেলতে গিয়ে উপরি আয়ের টাকা উড়িয়েও তার বেশ কিছু ঋণ হয়ে গেছে। আশরাফ আলীর কাছ থেকেও সে বড় অঙ্কের টাকা ধার নিয়েছে। সুতপা সেটা জানে না।

৭.

আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাড়ার...

এরপরের লাইনগুলো যেন কী? অনেকক্ষণ ধরে সেটা মনে করার চেষ্টা করছেন আশরাফ আলী। এর আগের লাইনগুলোও তার মনে পড়ছে না। আদৌ কি এর পরে কোন লাইন আছে! ঘুম থেকে ওঠার পর এ লাইনটাই কেবল মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। বাসায় কেউ নেই। টেবিলে নাস্তা দেয়া ছিল। তিনি চুপচাপ খেয়ে নেন। একা একা খেতে খেতে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিছুদিন হল সুপ্তি, তাহমিনা কেউ তার সাথে খেতে বসছে না। রাতে আতঙ্কিত হবার পর থেকে তাহমিনা তার সাথে ঘুমানোও বাদ দিয়েছে। সে অন্যঘরে সুপ্তির সাথে শোয়।

ভালোই হয়েছে, তিনি ভাবেন। নতুন নতুন ঘটনা মানেই নতুন নতুন কবিতা। ছাত্রজীবনে কবিতারা যেভাবে দলে দলে তার কাছে আসত এখন সেভাবেই আসছে। কবিতার এই স্রোত থেমে গিয়েছিল বিয়ের পরেই। তাহমিনার সাথে তার বিয়ে হয় একদিনের নোটিশে। তখন অনার্স পরীক্ষা চলছিল। চার নম্বর পরীক্ষার দিনই তাহমিনা গম্ভীর মুখে জানায়, আশরাফ আজ আমি বাসায় ফিরব না।

কেন?

বাসায় ফিরতে পারব না।

কী হয়েছে?

বাসায় গেলেই আব্বা আমার বিয়ে পড়িয়ে দেবেন।

বল কী! তোমার আব্বা তো আল্লাওয়ালা লোক, তিনি কেন জোর করে তোমাকে বিয়ে দেবেন?

কার কাছ থেকে যেন আব্বা তোমার কথা জানতে পেরেছেন। তুমিতো কোরানে হাফেজ না। তোমার সাথে আব্বা আমার বিয়ে দেবেন না।

তাহলে?

আজ বাসায় গেলেই আব্বা নজরুলের সাথে আমার বিয়ে পড়িয়ে দেবেন।

নজরুলটা আবার কে?

আব্বার ছাত্র। তার আন্ডারে পিএইচডি করছে।

তাহমিনা সেদিন বাসায় ফেরেনি। বিয়ে করে ওরা উঠেছিল বন্ধু সাজ্জাদের বাসায়। বিয়ের পর তাহমিনার বাবা থানায় অপহরণের কেস ঠুকে দেন। সে নিয়ে আশরাফকে তিন মাস জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছিল। দুজনের কারোরই সেবার অনার্স পরীক্ষা দেয়া হয়নি। সংসারের কঠোর বাস্তবতার প্রথম বলি ওটা। দ্বিতীয় বলি, কবিতা। দুজনের ছোট সংসার চালাতেই কী পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে এ সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই ছিল না। সারাদিন খেটে পিটেও সংসারে অভাব কাটে না। অসহ্য সেই দিনগুলোতে কোন কবিতাই সে লিখতে পারেনি। সারাদিন কাজ কর্ম শেষে তাহমিনার সাথে ভাব ভালোবাসা করতেই তখন বেশি ভাল লাগতো। এতোদিন পর আবার কবিতা এসে তার কাছে ধরা দিচ্ছে। ভাবতেই আশরাফ আলীর মনটা চনমনে হয়ে ওঠে। কাগজ কলম নিয়ে নাস্তার টেবিলেই ফস করে তিনি একটা কবিতা লিখে ফেলেন। সুতপাকে শোনানো দরকার। তিনি সুতপাকে কল করেন।

হ্যালো।

কী করছিস?

পাপ্পুর স্কুলে যাচ্ছি।

নতুন একটা কবিতা লিখেছি, শুনবি?

শোনাও?

এক বিকেলে ফুড়ুৎ করে
যেই পাখিটা উড়াল দিল
হারিয়ে যাওয়া সেই পাখিটা
আজ সকালে আসলো ফিরে

ও পাখি তুই কোথায় ছিলি
অবাক আমি জিজ্ঞেস করি
বলল পাখি ঝাঁকিয়ে ডানা
আকাশ জুড়ে কাটছি বিলি

তবে কেন ফিরলি বল
পাখির চোখে অনেক জল
বলল পাখি, বৃক্ষ তোমার
বুকেই আছে জোনাক দল

কেমন হয়েছে?
ভাল। কণ্ঠস্বর শুনে আশরাফ আলী পেছনে ফিরে তাকান। দরজায় তাহমিনা দাঁড়িয়ে। তার পরনে চওড়া হলুদ পাড়ের লাল সবুজ ডোরাকাটা কাতান শাড়ি।

৮.
এই কোন শাড়ি পরব? এটা দেখতো।
নাহ্।
এটা, তাহমিনা হলুদ একটা জামদানি দেখায়।
ওটা পর, খাটে আধশোয়া ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা অশরাফ চওড়া হলুদ পাড়ের লাল সবুজ ডোরাকাটা কাতান শাড়ি দেখায়।
তাহমিনা শাড়ি পরতে শুরু করে। কটা বাজে?
চারটা। ছটায় ট্রেন। অনেক দেরি আছে।
দেখতে দেখতে চলে যাবে।
তাইতো দেখলাম। সাত দিনের ট্যুর। এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল!
তাহমিনা কপালে লাল টিপ দিতে দিতে বলে।
ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আশরাফ তাকে মুগ্ধ চোখে দেখে। চোখ চোখ পড়তেই তাহমিনা চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী!
সুন্দর লাগছে।
তাহমিনা হাসে। তার গজদন্ত ঝিকমিক করে ওঠে।
আব্বু, এমন সময় সুপ্তি ঘরে ঢোকে।
কী হয়েছে মামনি?
এই আসিফ কোথায়? তাহমিনা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করে।
ও বাগানে খেলছে।
তুই ওকে একলা রেখে চলে এলি!
ওতো আসল না।
তাহলে তুই এলি কেন? তাড়াতাড়ি ওর কাছে যা।

আব্বু, মা আমাকে বকছে কেন? সুপ্তি টলমল আহ্লাদি চোখে বাবার দিকে তাকায়। সুপ্তি যেন তাহমিনার দ্বিতীয় সংস্করণ। সবকিছু হুবহু এক এমনকি গজদন্তটাও।

না, তোমাকে কেউ বকবে না। এই তুমি ওকে বকছো কেন? আশরাফ তাহমিনাকে কপট চোখ মটকায়।

তাড়াতাড়ি যাও না। আসিফকে নিয়ে আস। তাহমিনা ছটফট করে ওঠে।

যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। আশরাফ আসিফের কাছে যায়।

দু' বছর বয়সেই আসিফ খুব দুরন্ত, ছটফটে। কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। একবার সে বাবার টাকাভর্তি মানিব্যাগ নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিয়েছিল। আরেকবার দরজা খোলা পেয়ে একা একা চলে গিয়েছিল রাস্তার পাশের দোকানে। খুলনায় সাত দিনের ট্যুরেও আসিফ সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদে উঠে গিয়েছিল। ওকে দেখেশুনে রাখাটাই ছিল বড় একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে গিয়েই আশরাফের সাথে তাহমিনার সম্পর্কটা আরো বন্ধুত্বপূর্ণ গাঢ় হয়ে ওঠে। ফিরে আসার দিন রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আসিফ ছুটোছুটি করছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাহমিনা জিজ্ঞাসা করে, এই বলতো আসিফ বড় হয়ে কী হবে?

আমার মনে হয় তোমার ছেলে বিশ্বপ্রেমিক হবে, আশরাফ হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

কেন?

দেখছো না কেমন মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরঘুর করছে! ওয়েটিং রুমে আসিফের বয়সী আরেকটা বাচ্চা মেয়ে বাবামার পাশে চুপচাপ বসে আছে। আসিফ তার কাছে যেয়ে তাকে খেলার জন্য ডাকছে। মেয়েটা ড্যাব ড্যাব করে একবার আসিফ একবার তার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে।

তোমার মত?

আমি বিশ্ব প্রেমিক ছিলাম কবে?

ছিলে না! ট্রেনের হুইসেলে তাহমিনার কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়।

তাড়াতাড়ি চল, আশরাফ উঠে দাঁড়ায়।

এই সুপ্তি এদিকে আয়, তাহমিনা ডাকে। তাহমিনা একহাত দিয়ে সুপ্তিকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, আরেক হাতে স্যুটকেস। আশরাফের কোলে আসিফ। হাতে ব্যাগ। স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেনটা মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য থামবে। এর মধ্যেই উঠতে হবে। হুড়োহুড়ির ভেতরে আশরাফ কোনরকমে ট্রেনের দরজায় পৌঁছায়।

পাদানীতে পা দিয়ে আসিফকে কোল থেকে নামিয়ে সে পেছনে তাকায়। তাহমিনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ব্যাগটা ধরে কে যেন টানছে। তাকে ঠেলে কয়েকজন দরজা দিয়ে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়ে। ট্রেনটা নড়ছে। আশরাফের ঘাড় ধরে কে যেন হ্যাঁচকা টান দেয়। তাল সামলাতে না পেরে সে প্ল্যাটফর্মে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ট্রেন চলছে। ট্রেনের দরজা দিয়ে সে আসিফকে এক ঝলক দেখে। তারপর তার আর কিছুই মনে নেই।

আজ সেই ভয়ঙ্কর দিন। প্রতিবছর এই দিন আসলেই চওড়া হলুদ পাড়ের লাল সবুজ ডোরাকাটা কাতান শাড়িটা পরে অবিকল সেদিনের বেশে তাহমিনা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কথা বলে।

৯.

কেমন আছ আশরাফ? তাহমিনা চেয়ারে মুখোমুখি বসে।

আশরাফ আলী কল কেটে ফোনটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে উত্তর দেন, ভাল।

আজকের দিনেও!

তাহমিনার কথার শীতল ঝাঁঝ তাকে কাঁপিয়ে দেয়। তিনি চুপ করে থাকেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া থেকে শুরু করে পীর ফকির ধরা– আসিফকে খুঁজে পেতে এর কোনকিছুই বাদ রাখা হয়নি। আসিফকে পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি সেই পুরোন তাহমিনাকেও। আসিফ হারিয়ে যাওয়ার পর তাহমিনার সব ঘৃণা এসে জমা হয় তার উপর। যেন তিনি ইচ্ছা করেই আসিফকে হারিয়ে যেতে দিয়েছেন। যতোই দিন গেছে ওদের সম্পর্কটা শীতল থেকে শীতলতর হয়েছে। এই শীতলতা ছড়িয়ে পড়েছে মেয়ে সুপ্তির ভেতরও।

জান আশরাফ কাল রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। কী দেখেছি শুনতে চাও?

আশরাফ আলী কথা বলেন না।

তাহমিনা স্বগোক্তির মতো বলতে থাকে। দেখেছি আসিফ ট্রেনে বসে আছে। ট্রেনটার রং কখনো লাল, কখনো হলুদ, কখনো গোলাপী। আমরা সবাই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছি। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ তুমি দৌড়ে ট্রেনে উঠে গেলে। আসিফ আর তুমি ট্রেনের জানালা দিয়ে হাসতে হাসতে হাত নাড়ছো। তারপর ট্রেনটা হঠাৎ ঘুরে প্লাটফর্মের উপর আমাদের চাপা দিয়ে চলে গেল... তাহমিনা চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে তার মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে বলে, বুঝলে আশরাফ।

তাহমিনার গরম নিঃশ্বাস আশরাফ আলীর মুখে এসে পড়ে। তার চুলের ঘ্রাণ, তার চোখের চাহনিতে তিনি তার দিকে না তাকিয়ে পারেন না। তাহমিনার চোখ

জুড়ে জল চিকচিক করছে। জলে ভেজা তার চোখজোড়া যেন কোন স্বর্গীয় অভিমান নিয়ে বলতে চাইছে, আশরাফ তুমিও!

তিনি আলতো করে দুই হাত দিয়ে তাহমিনার গাল ধরেন, আমার কী দোষ বল? অনুযোগে তার গলা বুজে আসে।

তাহমিনা এক দৃষ্টিতে অনেক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। তার চোখে আগুনের আভা। আশরাফ আলীর মনে হয় অনন্তকাল ধরে তিনি কোন আগ্নেয়গিরির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে তাহমিনা তীর্যক ভঙ্গিতে বলে তোমার দোষ জানতে চাচ্ছ আশরাফ? তুমি জান না!

আসিফের হারিয়ে যাওয়াতো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, তাহমিনা! এজন্য এতোগুলো বছর ধরে আমাকে যে শাস্তি তুমি দিচ্ছো...

তুমি কি মুক্তি চাও আশরাফ? তাহমিনা তার কথা শেষ করতে দেয় না।

আশরাফ আলী থমকে যান। এভাবে বলছ কেন?

সেজন্যই কি সেদিন রাতে আমাকে গলা টিপে খুন করতে গিয়েছিলে?

কী বলছ তাহমিনা! আমি তোমাকে খুন করতে যাব কেন?

খুন করা তোমার জন্য কোন ব্যাপার না, আশরাফ। তুমিতো হাসতে হাসতে খুন করতে পার।

আমি! তাহমিনা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কেন, অরিয়নকে তুমি খুন করোনি? তাহমিনার চোখে ঘৃণার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে।

১০.

আলো আঁধারির পরিবেশ। লো ভলিউমে মেহেদী হাসানের গজল বাজছে। আশরাফ আলী মন দিয়ে গানের মূর্ছনার সাথে মিশে যাবার চেষ্টা করছেন। টেবিলে বোতলটা প্রায় খালি। তিনি ওয়েটারকে ইশারায় আরেকটা বোতল নিয়ে আসতে বলেন। মনটা তার ভীষণ রকম খারাপ। তাহমিনা তাকে বড় রকমের ঝাঁকি দিয়েছে। সে খুনি!

আরে আশরাফদা যে!

নিখিলকে দেখে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, নিখিল বস।

আপনি এখানে!

এইতো এলাম, নেশা নেশা স্বরে আশরাফ আলী জবাব দেন। নাও খাও, তিনি নিখিলের দিকে বোতল এগিয়ে দেন।

আপনাকে কখনো মদ খেতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না! নিখিল বাড়িয়ে দেয়া বোতলটা ধরে।

দেখনি, দেখবা। আশরাফ আলী নেশায় পুরো বুঁদ। বুঝলা নিখিল মনে অনেক দুঃখ, অনেক। একটানে গ্লাসের সবটুকু তিনি খালি করে ফেলেন। তোমাকে পেয়ে ভালোই হয়েছে। তোমার ভাবি বলে আমি নাকি খুনি! তোমার কি তাই মনে হয় নিখিল।

কী বলেন, আপনি খুনি হতে যাবেন কেন?

আমিও তাই বলি। ওটা কি আসলে খুন ছিল?

কোনটা? নিখিল আশ্চর্য হয়।

আরে ওইটা। তুমি জান না?

নাহ! চলেন আশরাফদা বাসায় যাই।

রাখ তোমার বাসা। কাহিনী শোনো। তিনি ওয়েটারকে আরেকটা বোতল দিয়ে যেতে ইশারা করেন। একি নিখিল তুমি খাচ্ছ না কেন? নাও খাও, তিনি নিখিলের

দিকে খালি গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকেন। বিয়ের প্রথম বছরের মাথাতেই তোমার বৌদি আনন্দে ঝলমল করা মুখ নিয়ে একদিন বলে, শুনেছ একটা সুসংবাদ আছে!

অমি তখন সবেমাত্র পত্রিকা অফিস থেকে ফিরেছি। তোমার বউদিকে বললাম, সুসংবাদ! চাকরি পেয়েছ কোন?

সংসারে অবস্থা তখন এমন যে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ই মাথায় প্রথম আসা স্বাভাবিক। কী বল নিখিল?

সেটা ঠিক, নিখিল জবাব দেয়। তারপর?

দেখছ ইন্টরেস্টিং লাগতেছে না? আশরাফ আলী চেঁচিয়ে ডাকেন, ওয়েটার! তারপর আবার বলতে থাকেন, আমার কথা শুনে তোমার বৌদির মুখের ঝলমলে আলো নিভে যায়। আরে বল, তোমার সাথে মজা করলাম। তাহমিনা মন খারাপ করেছে বুঝতে পেরে বলি।

না, থাক। ও অভিমান করে।

আরে বল না। ওকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খাই, বল।

অরিয়ন আসছে।

অরিয়ন!

ভুলে গেছ? আমরা না ঠিক করেছিলাম আমাদের প্রথম সন্তানের নাম রাখব অরিয়ন। এবার বুঝেছ, বলেই তোমার বৌদি লজ্জায় মুখ ঢাকে।

মানে... তুমি মা হতে যাচ্ছ!

হ্যাঁ। তুমি খুশি হওনি?

হু! আমি খানিকটা গম্ভীর হয়ে যাই। তোমার বৌদি বুঝতে পারে আমি খুশি হইনি। এটা কি খুশি হবার মত খবর, তুমি বল?

নিখিল জানে মাতাল লোকের সাথে তর্ক করা আর পাগলকে সাঁকো না নাড়াতে বলা একই কথা। তাই সে আশরাফ আলীর কথায় মাথা দুলিয়ে সায় দেয়।

তখন দুজনের সংসার চালাতেই প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তিনজন হলে কী হবে এই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। তাহমিনাকে বললাম অ্যাবোরশনের কথা। সে রাজি না। বলে, দুই মাস হয়ে গেছে। থাকুক না বাচ্চাটা। বাধ্য হয়ে জোর করেই অ্যাবোরশন করালাম। এটা কি খুন? এটাতো প্রয়োজন। বাচ্চাটা হলে না খেয়ে মরতো, ঠিক কিনা বল?

বুঝতে পেরেছি আশরাফদা। বৌদি আপনাকে খুনি বলে কাজটা ঠিক করেননি। নেন এখন চলেন বাসায় যাই?

বাসা! কার বাসা, কোন বাসা? আমার ক্ষিধাতো এখনো শেষ হয় নি। এই ওয়েটার, ওয়েটার! আশরাফ আলী জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন।
আশরাফদা চলেন অন্য কোথাও যাই, চলেন। নিখিল তাকে টেনে তোলে। এর চেয়ে ভাল জিনিস আপনাকে খাওয়াবো, চলেন।
সত্যি? টলতে টলতে আশরাফ আলী উঠে দাঁড়ান। তারপর কিছু মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে মানিব্যাগ বের করে টাকা বের করার চেষ্টা করেন।
নিখিল হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগটা নেয়, আমি বের করে দিচ্ছি।
আশরাফ আলী খুশি হয়ে নিখিলের পিঠ চাপড়ে দেন, তুমিই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।
ওয়েটারকে বিল দেয়ার সময় নিখিল আলগোছে কয়েকটা নোট নিজের পকেটে রেখে দেয়।

১১.

সাদা সিলিংয়ে সিলভার কালারের ফ্যানটা বন বন করে ঘুরছে। আলো ঝলমলে একটা নকশাকে ফ্যানের ঘুরন্ত ব্লেড অবিরাম ফালাফালা করে যাচ্ছে। নকশার জন্মস্থান হচ্ছে ঘরের একমাত্র ভেন্টিলেটার। তার ফোকর থেকে একটা চড়ুই ছানা ড্যাবড্যাব চেয়ে আছে। আশরাফ আলী চোখ মেলতেই ছানাটা ফোকরের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে নেয়। তিনি এদিক ওদিক তাকান। ঘরটাকে চেনা চেনা লাগছে। ডানে ঘাড় ফেরাতেই দেয়ালে তাদের ঘরোয়া ছবিটা দেখা যায়। তাহমিনা, সুপ্তি, আসিফ আর তিনি এই চারজনের হাসিমাখা ছবি। নিশ্চিত হতে তিনি বায়ের দেয়ালে তাকান। তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ছবি, কক্সবাজার ট্যুরে তোলা। চারিদিকে অথৈ পানি আর পানি। নৌকার গুলুইয়ে ওরা দুজন বসে আছে। বাতাসে তাহমিনার চুল উড়ছে। দুজনের চোখেই সানগ্লাস, মুখে হাসি।
স্যুপের বাটি নিয়ে তাহমিনা নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে, স্যুপটুকু খেয়ে নাও।
তুমি! আশরাফ আলীর মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে।
অন্য কাউকে আশা করছিলে?
তিনি চুপ করে থাকেন।
স্যুপ খাও, চামচে করে তাহমিনা স্যুপ এগিয়ে দেয়। বিনাবাক্য ব্যয়ে যন্ত্রচালিতের মত তিনি তা মুখে পোরেন। তুমিতো কখনো মদ খেতে না আশরাফ!
তিনি নিশ্চুপ থাকেন। এই তাহমিনাকে তিনি কিছুতেই মেলাতে পারেন না। শেষ কবে তিনি বাসায় এমন ব্যবহার পেয়েছিলেন মনে করার চেষ্টা করেন।
কী হল কথা বলছো না কেন?
এই খেলাম একটু।
একটু কোথায়! বেহেড মাতাল ছিলে তুমি। নিখিল বলল, রাস্তায় বমিও করেছো। তোমার এতো অধঃপতন, ছিঃ!

আশরাফ আলী কুঁকড়ে এতোটুকু হয়ে যান। তিনি বলতে চান, তোমার জন্যই তো তাহমিনা! কেমন করে তুমি আমাকে খুনি বললে! অরিয়নের বিষয়টিতে শেষ পর্যন্ত তোমারও সায় ছিল। আমাদের যত স্যাক্রিফাইস সবই সংসারের প্রয়োজনে, ভালোবাসার টানে। সম্পর্কের মাঝখানে তৈরি হওয়া এত দূরত্বের পরও এই যে এখনও আমরা একসাথে, এর পেছনে সেই ভালোবাসাই দাঁড়িয়ে। অথচ তাহমিনা তুমি ভাব আমি তোমাকে খুন করতে চাই, সুপ্তি ভাবে বাবা হিসেবে আমি অযোগ্য। বল এটা কি আমার প্রাপ্য?

তাহমিনা কোন কথা বলে না। হঠাৎ করেই সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অবচেতন মনের বলয় থেকে তিনি পুরোপুরি জেগে ওঠেন। দেয়ালের ঘড়িতে দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। তিনি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ান। খুব দুর্বল লাগছে। দেয়াল ধরে বড় করে শ্বাস নেন। মাথার ভেতরে কেমন ঝিমঝিমে ভাব, অনুভূতি ভোঁতা। বার থেকে নিখিলের সাথে বের হবার পর কী ঘটেছিল কিছুই তার মনে নেই। নিখিলই কি তাকে বাসায় দিয়ে গেছে? হয়তো। চোখেমুখে পানির ঝাপটা দেয়ার পর খানিকটা ভাল লাগে। পুরো বাড়ি খালি। সুপ্তির পোষা কুকুর এলি তাকে দেখে ছুটে আসে। পায়ে মুখ ঘষে। ডাইনিং টেবিলে খাবার পড়ে আছে, ঠাণ্ডা। গরম করতে ইচ্ছা হয় না। চুপচাপ বসে একনাগাড়ে তিনি খেয়ে যান। এলি বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসে তার খাওয়া দেখে।

খাবি? এলির দিকে তিনি এক টুকরো মাংস এগিয়ে দেন।

এলি মুখ ফিরিয়ে নেয়। ক্ষিধা নেই।

তিনি এলিকে ভাল করে খেয়াল করেন। এলি দেখতে বেশ নাদুস নুদুস। চকচকে চমড়া। চেহারায় যত্নের ছাপ স্পষ্ট। এলিকে তিনি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। কয়েক মাস বয়সী বাচ্চাটার তখন একেবারে হাড় জিরজিরে অবস্থা। সুপ্তির হাতে খাবার দেখে ছুটে এসে লেজ নাড়ছিল। সুপ্তির বায়না মেটাতে ওটাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়। ওকে এখন কেউ দেখলে বলবে না যে এই সেই মৃতপ্রায় কুকুরছানা! তাকিয়ে থাকতে থাকতে এলির প্রতি তিনি এক ধরনের হিংসা অনুভব করেন। অভিমানে তার বুকটা উথলে ওঠে। এই সংসারে এলিও তার থেকে বেশি যত্ন পায়! তিনি কি এই এতোটাই অপ্রয়োজনীয়! সংসারের জন্য তিনি কি কিছুই করেননি! এই যে জীবনের এতোগুলো বছর সংসার সংসার করে তিনি জলাঞ্জলী দিলেন, এই যে কবি হবার স্বপ্ন বাদ দিয়ে সংসার গোছাতে সারা জীবনের উদয়াস্ত পরিশ্রম এসবই তাহলে বৃথা! অভিমানে তার চোখ ফেটে পানি আসে। টপটপ করে ফোটা ফোটা পানি টেবিলের ওপর ঝরে পড়ে। এলি কুঁই

কুঁই করে তার কোলে এসে মুখ ঘষে সান্ত্বনা দিতে চায়। এমন সময় কলিংবেল বেজে ওঠে।

চোখ মুছে তিনি দরজা খোলেন।

তাকে দেখে সুপ্তির চেহারায় কোন ভাব ফোটে না। নির্লিপ্তভাবে সে বাবাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে।

কেমন আছিস? সুপ্তি না শোনার ভান করে এগিয়ে যায়?

তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছি।

সুপ্তি থামে না।

কথা কানে যায় না? আশরাফ আলীর কণ্ঠে আক্রোশ ভর করে।

সুপ্তি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবার মুখোমুখি হয়। কী হয়েছে চেঁচাচ্ছো কেন?

চেঁচাচ্ছি মানে? তিনি আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন।

আস্তে কথা বল। অভদ্রের মতো চেঁচিয়ো না।

চেঁচাবো না মানে? তোমরা কি পেয়েছ?

আপনি কি পেয়েছেন? মদ খেয়ে সারারাত বেহুঁশ ছিলেন। এখন ভর দুপুরে মাতলামি করছেন? লজ্জা করে না।

সুপ্তি!

থামুন। আপনার মুখে সুপ্তি ডাক শুনতে জঘন্য লাগে।

সুপ্তি আমি তোর বাবা, আশরাফ আলী আর্তনাদ করে ওঠেন।

আপনি আমার বাবা নন। জন্ম দিয়েছেন ব্যাস এটুকুই। আপনার মত খুনি, চরিত্রহীন, লম্পট, মদখোর লোকের আমার বাবা হওয়ার কোন অধিকার নেই।

আমি খুনি, চরিত্রহীন, লম্পট!

কেন আপনি অরিয়নকে খুন করেননি? আসিফকে হারিয়ে যেতে দেননি? মাকে গলা টিপে খুন করার চেষ্টা করেননি? পারলে অস্বীকার করুন, সুতপার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই?

মুখ সামলে কথা বল সুপ্তি! আশরাফ আলী গর্জে ওঠেন।

আড়াল করার চেষ্টা করে লাভ নেই। আপনার ড্রয়ারে লুকানো সুতপাকে লেখা চিঠিগুলো আমি পড়েছি।

পূর্ণেন্দু পত্রী'র ঢংয়ে সুতপাকে উদ্দেশ করে তিনি কয়েকটি চিঠি কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু সেগুলো কখনো তাকে দেয়া হয়নি। ওগুলোর কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। এরা তার ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করে! আশরাফ আলী অবাক

হন। তার কী নিজস্ব বলে কিছু থাকতে পারে না! রাগে ক্ষোভে তিনি হঠাৎ খুব ক্লান্ত অনুভব করেন, কী বলতে চাও?
বলতে চাই সুতপাকে আপনি যখন এতই ভালোবাসেন তাহলে তাকে নিয়েই থাকুন না। আমাদের খোঁজখবর নিতে আসেন কেন? আমাদেরকে আমাদের মত থাকতে দিয়ে আপনার যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ান।
তুমি তাতে খুশি হও?
হ্যাঁ, হই মিস্টার আশরাফ আলী। আপনি থাকা না থাকায় আমার কিচ্ছু এসে যায় না।
কিচ্ছু না?
না।
আমি যদি সুইসাইড করি?
করেন।
আশরাফের আলীর মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। ক্যাম্পাসে লিনার লাশ যেদিন এসেছিল সেদিনও তিনি কিছু বলতে পারেননি। অথচ সেদিন তিনি কত কথা বলতে চেয়েছিলেন, না লিনা এটা হতে পারে না। তুই এভাবে চলে যেতে পারিস না। তুই আমার। আমার সব কবিতা তোর। সব স্মৃতি তোর। তোকে আঁকড়ে ধরেই আমি এতদূর এসেছি, আমরা দুজন আরো অনেক দূরে যাব। অনেক পথ পাড়ি দেব।
বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কিছুদিন পর লিনার লেখা শেষ চিঠিটা তার হাতে এসে পৌঁছায়–
প্রিয় কবি,
অনেক অনেক ভালোবাসা তোকে। কেমন আছিস? নতুন কোন কবিতা লিখেছিস? এখানে বেড়াতে এসে মন একদম টিকছে না। সবাই কত আনন্দ উল্লাস করছে। আমি পারছি না। কেবলই তোর কথা মনে পড়ছে। তোকে আমি এত ভালবাসি কেন? তোকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি। কবিতা হয়েছে কিনা বুঝছি না। মনে হয় ছড়া হয়ে গেছে। আবার মনে হচ্ছে ঘোড়ার ডিম। তবু তোকে শোনাই–
বইছে বাতাস যাচ্ছে মেঘ
মেঘ যাচ্ছে উড়ে উড়ে
মেঘ যাচ্ছে কার বাড়ি
একলা আমি সাগর পাড়ে

ভাবছি সাগর দেই পাড়ি
তুই থাকলে ভাল হতো
ওরে আমার পাগলা ঘোড়া
পিঠে চড়ে চাবুক মেরে
হতাম দুজন ছন্নছাড়া...

কেমন হয়েছে? তুই নিশ্চয়ই অখাদ্য পড়ে মুখে ধুতে যাবি। যা। কী করব বল, আমিতো তোর মত ভাল লিখতে পারি না। তোর ওই কবিতাটা মাকে দেখিয়েছিলাম। ওই যে, যেটা তুই আমার ওপর রাগ করে লিখেছিলি–

প্রতিরাতেই ভাবি আগামীকাল আমি স্বার্থপর হবো

প্রতি সকালেই জেগে দেখি
আমি নিঃস্বার্থদের একজন হয়ে অপরকে করছি আপন
আমার সেই আপনজন
যখন যেমন প্রয়োজন
আমাকে করছে ব্যবহার আপন খেয়ালের বশে
আমি বিনয়ের অবতার বুঝেও বুঝি না কিছু আমারই স্বভাব দোষে

জানি স্বার্থ ফুরোলেই ছুড়ে ফেলা হবে একদিন
নোংরা ভাগাড়েই কেটে যাবে জীবনের বাকি দিন

তবুও হয়তো বা আমি নিঃস্বার্থই রবো
অথচ প্রতিরাতেই ভাবি
আগামীকাল আমি স্বার্থপর হবো।

মা খুব পছন্দ করেছেন। তোকে বাসায় নিয়ে আসতে বলেছেন। এবার এসেই তোকে বাসায় নিয়ে আসব।

আমি জানি তুই অনেক বড় কবি হবি। আমি থাকলেও হবি না থাকলেও হবি। ওভাবে চেয়ে আছিস কেন? মানুষের প্রতিটা মুহূর্তই অনিশ্চয়তায় ভরা। আমি না

থাকলে প্লিজ আমাকে একেবারে ভুলে যাস না। তোর আত্মজীবনীতে অন্তত আমার কথা লিখিস। আর কী? ভালো থাকিস। ভালোবাসিস।

ইতি
তোর লিনা

মানুষ কি আগেভাগে তার নিয়তি বুঝতে পারে? বিশেষ করে অশুভ কোন কিছু। মনে হয় পারে। আশরাফ আলী তার নিয়তি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। এই সেই ছোট্ট সুপ্তি, যে তার কোলে উঠলে আর নামতেই চাইতো না! বাবা কখন আসবে তার অপেক্ষায় না খেয়ে রাত জেগে বসে থাকত– সেই ছোট্ট সুপ্তি এখন কত বড় হয়ে গেছে। অবলীলায় সে কত কঠিন কঠিন কথা বাবার মুখের উপর বলে গেল! আশরাফ আলীর মনে হয় হঠাৎ করেই তার বয়স যেন বছর দশেক বেড়ে গেছে। ক্লান্তিতে তার চোখ একেবারে বুজে আসতে চায়। অবসন্ন শরীরে তিনি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেন।

১২.
প্রিয় সুপ্তি মা আমার,
তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস। আমি এতোদিন খেয়াল করিনি। আজ তোকে দেখে, তোর কথা শুনে অনুভব করলাম– তুই সেই ছোট্টমণিটি আর নেই। তোকে অভিনন্দন।

সময় খুব দ্রুত চলে যায়। এতো দ্রুত যে সময়ের অনেক কিছুই আমরা খেয়াল করতে পারি না, পরে অনুভব করি। আজ অনেকদিন বাদে পেছন ফিরে তাকিয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টা করে দেখলাম সবকিছু অস্পষ্ট ঝাপসা। বুঝতে পারলাম এখনকার সময়ে নিজের কাছেই আমি আগুন্তুকের মতো। নিজের ছায়াকে ফেলে এগিয়ে যাবার সময় এসে গেছে।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছেরে মা। এতোদিনের পরিচিত এই বলয় ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে খারাপ লাগছে। হাজার হাজার স্মৃতি এসে মনে ভিড় করছে। তোর মনে আছে জাফলং বেড়াতে গিয়ে তুই ডুবতে বসেছিলি? মনে হয় ভুলে গেছিস। তোকে টেনে তুলতে গিয়ে আমিও মরতে বসেছিলাম। তারপর তোর সে কি কান্না। তোর সেই কান্নাভেজা মুখ আমি এখনো ভুলতে পারি না। মনে আছে আরেকবার কান্না থামাতে তোকে কাধে করে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তুই বায়না ধরেছিলি ভালুকটাকে বাসায় নিয়ে আসবি! খেলনা একটা ভালুক কিনে দেবার পর তোকে থামান গিয়েছিল। সেই ভালুকটার সাথে তোর কত কথা হতো। অফিস থেকে ফিরলেই আমার গলা জড়িয়ে ভালুকের গল্প শোনাতি। সেই দিনগুলো, মা আমার আর কখনো ফিরে আসবে না। সময় এত নির্মম কেনরে?

সুপ্তি, অনেক কথাই তুই আজ আমাকে বলেছিস। এ ধরনের আলোচনা তোর সাথে করতে হল বলে আমি খুবই বিব্রত। তোর অভিযোগগুলো খণ্ডানোর কোনো চেষ্টাই আমি করব না। তোর সাথে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তার দায়ভার আমাকেই নিতে হবে। তবে তোকে একটা কথা বলতে চাই। সংসার খুব জটিল যায়গা। এই জটিলতার ভেতরেই আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে একটা পরিবার। অনেক অনেক কিছুর মারপ্যাঁচে পরিবারটা বেড়ে ওঠে, টিকে থাকে। পাওয়া না পাওয়ার ভেতর দিয়েই একে অন্যের ছাড়ে পরিবারের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকে। একা কেউ সেই কেন্দ্রকে ভাঙ্গতে পারে না। পরিবারে ফাটল ধরা মানে এর সাথে জড়িত সব সদস্যেরাই তার জন্য দায়ী। কথাগুলো খুব শক্ত হয়ে গেল বোধহয়। আজ না হলেও একদিন যখন তুই আরো বড় হবি, তোর নিজের পরিবার হবে, তখন তুই এই কথাগুলোর মর্ম বুঝবি।

সেসময় নিশ্চিত আমি থাকবো না। সেজন্যই এই কঠিন কথাগুলো তোকে বলা। আমি এতোদিন যে আঘাতে জর্জরিত হয়ে আসছি এবং আজ যে আঘাত আমি পেলাম তার জন্য কারো প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। হয়তো এটাই আমার নিয়তি। আমার মৃত্যুর জন্যও কেউ দায়ী নয়। তোরা ভাল থাকিস। তোর মাকে দেখেশুনে রাখিস।

আমি জানি আমার মৃতদেহ দেখে তোদের কারো চোখেই জল আসবে না। আমি চাই না আমার কবরও তোদেরকে আমার কথা মনে করিয়ে দিক। তোর প্রতি আমার অনুরোধ, মৃত্যুর পর আমার দেহটাকে হাসপাতালে দান করে দিস। তোর উপর আমার যদি এতটুকু দাবি থাকে প্লিজ আমার শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করিস। এর বেশি আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই।

ইতি
হতভাগ্য আশরাফ আলী

চিঠিটা আশরাফ আলী শেষবারের মত পড়লেন। তারপর টেবিলের ওপর রাখা ঘুমের ওষুধগুলো মুখে দিতে গিয়েও থমকে গেলেন। সুতপা তার হাত চেপে ধরেছে, আশরাফদা কী করছ! সুতপার হাত সরাতে গিয়ে দেখেন তিনি অন্ধকার খামচে ধরেছেন। অসম্ভব এক ভয়ে তিনি কুঁকড়ে যান। তার কপালে বিন্দু বিন্দু

ঘাম জমতে লাগল। তিনি পাপ্পুর হাসির শব্দ শুনলেন, শুনলেন কে যেন অনবরত তার দরজার কড়া নাড়ছে। হঠাৎ তার ভেতর থেকে কেউ বলে উঠল, "আশরাফ, আমি মরতে চাই না" । তিনি আরো ভয় পেলেন। তার মনে হল মৃত্যু স্বয়ং তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হিমশীতল ছোঁয়ায় তিনি থরথর করে কেঁপে উঠলেন। না, আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই বলে তিনি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত চেঁচাতে লাগলেন। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন স্বর বের হল না। চরম আতঙ্কিত হয়ে তিনি জ্ঞান হারালেন।

১৩.

মানুষ যখন নাকি মৃত্যুর কাছাকাছি হয় তখন তাকে ফেরেশতারা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করে। মানুষটির যাওয়ার জায়গাগুলো তখন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা আশরাফ আলীরও তেমন হয়েছে। কোথাও যেতে ইচ্ছে করলে ঘুরেফিরে সুতপাদের বাসার কথাই তার মনে পড়ে। সুতপাকে তিনি তার চিন্তার কথা বলেছেন। সুতপা হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে, যারা সারাক্ষণ মৃত্যু নিয়ে ভাবে, মৃত্যু তাদের কাছে দেরি করে আসে।

নারে সুতু আমি মনে হয় আর বেশিদিন বাঁচব না।

অলক্ষুণে কথা বলো না। সুতপা তাকে ধমকে থামিয়ে দেয়। তুমি না থাকলে বৌদি, সুপ্তি এদের কী হবে ভেবেছ?

ওদের এতে কিছু যায় আসে না, আশরাফ আলী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সুপ্তিতো সেদিন... বলতে গিয়ে তার গলা ধরে আসে।

আরে কর কী! সুতপা আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দেয়। তুমি এত বাচ্চা কেন? আমরা আছি না! পাপ্পু আছে।

পাপ্পু! সুতপার কাঁধ থেকে মাথা সরিয়ে তিনি হাত দিয়ে চোখ মোছেন। সরি, ওকে জাগিয়ে দিলাম মনে হয়!

আরে না। ও ঘুমালে কোন হুঁশ থাকে না। কিন্তু তুমি আর কখনো এমন করবে না, বুঝলে? আমাকে ছুঁয়ে প্রমিজ কর। সুতপা হাত বাড়িয়ে দেয়। লাল-নীল কাঁচের চুড়িগুলো ওর হাতে দারুণ ঝলমল করছে।

আশরাফ আলী মুগ্ধের মত সেদিকে তাকিয়ে আপন মনেই আওড়ে ওঠেন–

হাত ভরা চুড়িগুলো যেন খুব হাসছে
ইশারাতে চুপিসারে তারা কাকে ডাকছে!

মারাত্মক বলেছ! সুতপা হাততালি দিয়ে ওঠে, তারপর?

আর জানি না।

শেষ কর। আমি কাগজ কলম এনে দিচ্ছি।

আজ থাক।

কেন?

ভাল লাগছে নারে। আশরাফ আলীর কণ্ঠে বিষণ্নতা ঝরে পড়ে।

আবার? প্রামিজ কর তুমি আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না। সুতপা আবারো হাত বাড়ায়।

আশরাফ আলতো করে সুতপার হাত নিজের হাতে নেয়। তার স্পর্শে এমন কিছু ছিল, সুতপা কেঁপে উঠতে বাধ্য হয়।

১৪.

কথায় আছে বিপদ যখন আসে চারদিক থেকে একসাথে হুড়মুড় করে আসে। নিখিলেরও হয়েছে তাই। তার অফিসে দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট তদন্ত শুরু করেছে। সন্দেহভাজনদের মধ্যে সে অন্যতম। জুয়াতেও কদিন ধরে কপাল মন্দ যাচ্ছে। বেশ মোটা অঙ্কের দেনা তাড়াতাড়ি শোধের জন্য পাওনাদার জুয়াড়িরা তাকে প্রতিদিন চাপ দিচ্ছে। মরার উপর খাড়ার ঘা এর মত যোগ হয়েছে কাকা হরেন বাবু। তার মেয়ের বিয়ে। সেও তার পাওনা এক হপ্তার ভেতর ফেরত চায়। সুতপাও সেদিন কথায় কথায় বলছিল, আশরাফদার টাকাগুলো কবে ফেরত দেবে?

কেন? কিছু বলেছে?

না।

তাহলে তোমার এত দরদ কেন? নেশা করে আসায় নিখিলের মেজাজ এমনিতেই চড়া ছিল, আরো চড়ে যায়।

মানে!

মানে তুমি জান না। নিখিল চেঁচিয়ে ওঠে।

কী বলতে চাও পরিষ্কার করে বল। সুতপা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে নিখিলের মুখোমুখি হয়।

এতো বলাবলির কী আছে, নিখিল খেঁকিয়ে ওঠে। তোমাকে বললাম শালার কাছ থেকে আরো কিছু টাকা খসাও। তুমি পারলে না। হারামজাদার সাথে লটরপটর করতে পার আর টাকা চাইতে বললে দরদ উথলে ওঠে, তাই না। তোর টাকা মাগী?

বাজে কথা বলবে না বলছি।

ও পোড়ে তাই না! ভেবেছ আমি কিছুই বুঝি না!

বোঝ?

সুতপার ঠাণ্ডা তির্যক উক্তিতে নিখিল আরো ক্ষেপে যায়। খানকি মাগী, বেশ্যার বেটি আজ তোর একদিন কি আমার... সুতপাকে সেদিন সে কিছু বলতেই বাদ রাখেনি। ইদানীং মদ খেয়ে এমন বেসামাল সে প্রায়ই হয়। সুতপার গায়ে হাত তুলতেও তখন তার বাধে না।

বেসামাল হয়েই নিখিল ঘটনাটা ঘটাল। জুয়ার আসরে সে বউকে বাজি ধরে হেরে বসল। মদন শেখ পান খাওয়া দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, নিখিল ছাব আপনার টেকা আমি মাফ কইরা দিলাম মাগার বউ কলাম ছাড়ুম না, হে হে। কালকা দশটার আগেই বউরে লইয়া আমার এইহানে চইলা আইবেন কলাম। নাকি আমার যাওন লাগব? মদন শেখ শহরের নামকরা ত্রাস। নিখিল আজরাইলে পাওয়া মানুষের মত বাসায় ফেরে।

কী হয়েছে তোমার? নিখিলের অবস্থা দেখে সুতপা চমকে ওঠে।

কাপড় জামা গোছাও, আমাদের এখুনি বের হতে হবে।

কেন? সুতপা আতঙ্কিত হয়।

চলতো। নিখিল ব্যাগ বের করে সুতপার জামাকাপড় ভরা শুরু করে।

কেন? কী হয়েছে? কোথায় যাব? নিখিল! সুতপা ওর কলার ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকি দেয়।

সুতপা! নিখিল আর্তনাদ করে ওঠে। আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। মস্ত বড় ভুল।

কী ভুল? সুতপা আরো আতঙ্কিত হয়।

মস্ত ভুল। নিখিল ঘোরে পাওয়া মানুষের মত বলতেই থাকে।

না পেরে সুতপা নিখিলের গালে জোরে চড় কশায়, শাট আপ। ভগবানের দোহাই আমাকে সব খুলে বল।

চড় খেয়ে নিখিল ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর হাউমাউ করে সে সুতপাকে জড়িয়ে ধরে, সুতপা আমি জুয়াতে তোমাকে বাজি ধরে হেরে গেছি।

মানে! সুতপার প্রথমে বিশ্বাস হয় না। তুমি আমাকে বাজি ধরেছ! নিখিল তুমি আমাকে...

নিখিল আরো ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ইউ বাস্টার্ড! সুতপা আলিঙ্গনের ভেতর থেকে নিখিলকে সজোরে ধাক্কা দেয়। নিখিল ছিটকে গিয়ে ওয়াড্রোবের কোনায় বাড়ি খেয়ে নিথর হয়ে যায়।

ঘুম ভেঙ্গে পাপ্পু কখন যে বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়াল করেনি। সে সুতপাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, বাবা অক্ত।

১৫.

পাপ্পু স্থায়ীভাবে আসার পর পরিবারের সবকিছু যেন পাল্টে গেছে। তাহমিনা সারাদিন তাকে নিয়ে ব্যস্ত। পাপ্পুর এটা লাগবে, ওর জন্য ওটা কিনে এনো। চেহারাটা আমাদের আসিফের মত না! সরাক্ষণ এসব কথাবার্তায় সে আশরাফ আলীকে অতিষ্ঠ করে রাখে। পাপ্পু যখন কাতুকুতু দিয়ে আশরাফ আলীর ঘুম ভাঙ্গায় তখন সুপ্তিও খিলখিল করে হাসে। পরিবারের নতুন এ সুরে আশরাফ আলীর বেশ আনন্দ হয়। বিশেষ করে তাহমিনা যখন পুরোনো দিনের মত সেজে গুঁজে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, বলতো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বা রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে শরতের আকাশ দেখতে দেখতে যখন আদুরে ভঙিতে সে তার কাছে নতুন লেখা একটা কবিতা শুনতে চায় তখন খুশিতে তার চোখে পানি চলে আসে। আবার মাঝে মাঝে সুতপার জন্য ভীষণ মন খারাপ করে তার কাঁদতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে কান্না চেপে রেখে তিনি কবিতা লেখেন–

ভেতরে কে আছে জানি
বাইরে কে আছে তাও
তারপরও জানি না হৃদয়
কেন এত উতলাও?

১৬.

নিখিলের দুর্ভাগ্য। শক্ত কাঠের সাথে বাড়ি খেয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। হাসপাতালে নেবার পর ডাক্তারেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খুনোখুনির ভেতরে মদন শেখও নিজের পাওনা দাবি বুঝে নিতে আসেনি। সুতপাকে নেয়া হয় জেলে। পাপ্পুর ভরসা বলতে ছিল হরেন বাবু। কিন্তু তার গণক ঠাকুর কুষ্ঠি গুনে পাপ্পুকে বাপ মা খাওয়া প্রেত শিশু হিসেবে শনাক্ত করেন। সে যে পরিবারে যাবে সে পরিবারেরই মহা অনিষ্ট হবে জানার পর হরেন বাবু তার দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। অনাথ আশ্রমই ছিল পাপ্পুর শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু পাপ্পুর বম্মা তাহমিনা সেটা চায়নি। ওতো আমার আসিফের মতোই বলে সে পাপ্পুকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। সুতপা এতে আপত্তি করেনি। শুধু পাপ্পুকে দত্তক নেয়ার কাগজপত্রে সই আনতে গলে আশরাফ আলীকে সে বলেছে, ওই কবিতাটা একটু শোনাবে? ওই যে–

এই ভালো
এইভাবে, দেয়া নেয়া
নেয়া দেয়া
সব হলো
এইবার...